একটি অসম্পূর্ণ গল্প

আমার বই . কম
amarboi.com

বিভাস সরকার

সেই দেশভাগের সময় বড় মেয়ে অমরীকে কোলে করে, স্বামী রাধারমণের সঙ্গে এই বাড়িতে এসেছিলেন নয়নবালা। সঙ্গে শ্বশুর-শাশুড়ি আর এক অবিবাহিতা ননদ। এক মধ্যস্থ মারফত বাড়িঘর, চাষের জমি আবদুল হোসেনের সঙ্গে অদলবদল করে নিয়েছিলেন রাধারমণ। ওঁদের দেখাদেখি দুটো গ্রামের প্রায় সব পরিবারই অদলবদল করে নিয়েছিল নিজেদের জমিজমা। সদ্য দ্বিখণ্ডিত হয়ে সৃষ্ট দুটো দেশের দুটো গ্রাম নিজ নিজ ভৌগোলিক সীমায় থেকে গিয়েছিল, বদলে গিয়েছিল শুধু বসবাসকারী মানুষগুলো।

তারপর নয়নবালার জীবনে কেটে গিয়েছিল অনেকগুলো বছর। ননদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল যথাসময়।

শ্বশুর-শাশুড়ি সংসারের মায়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। ষষ্ঠী ঠাকরুনের দয়ায় একে একে আরও সাতটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন নয়নবালা। তবে দু'টিকে আতুর থেকেই ফিরিয়ে নিয়েছিলেন ঠাকরুন, না হলে আজ নয়নবালার দুই পুত্র আর ছয় কন্যা থাকত।

সামর্থ্য মতো, এক পুন্নি ছাড়া বাকি সব মেয়েরই ভাল ঘরে বিয়ে হয়েছে। একমাত্র ছেলে অনিল কলকাতায় থেকে, এম কম পাস করে সরকারি চাকরি করছে। নিজেই পছন্দ করে কলকাতারই মেয়ে বিয়ে করেছে। নয়নবালা কিংবা রাধারমণ কেউই আপত্তি করেননি। বরং ঘটা করেই বিয়ে দিয়েছেন। গত তিন বছর আগে অবধিও, প্রতি পুজো-পার্বণ, বিয়ে-শাদিতে বউ-বাচ্চা নিয়ে বাড়ি আসত অনিল। বাবা-মা, বোনদের জন্য কাপড়চোপড় কিনে আনত। ফিরে যাওয়ার সময় নিয়ে যেত বাড়ির ঘি, খেজুরগুড়, কালোজিরে, সর্ষে,... আরও টুকিটাকি। ওরা চলে যাওয়ার পর নয়নবালা কাঁদত, 'কত কষ্ট কইরা পোলাপান মানুষ করসি। আর এহন চোক্ষের দ্যাখা দ্যাখনের লিগা, দিন গোনতি হয়।'

রেগে যেত পুন্নি, 'ক্যান। একখান তো হগল সময়েই তোমার চক্ষের সামনেই। তা হেই পোড়াকপালিরে দ্যাইখা তোমার পরান জুড়ায় না, ন্যা?'

নয়নবালা বলত, 'অমন কথা কইস না মাইয়া।

ছোটকালে তুই সব চাইয়া বেশি হাড় জ্বালাইছস আমার! অ্যামন জেদি আসিলি, জেদের কান্না কাঁইন্দতে গিয়া চক্ষু উল্টাইয়া ফিট পড়তি। একবার তরে বারান্দায় শোয়াইয়া থুইয়া আমি পুকুরপানে গ্যাসিলাম। তর কান্নায় অতিষ্ঠ হইয়া, তর ঠাকুমায় তরে, ওই ডোবার ধারে কচুবনে ফ্যালাইয়া আইছিল।'

কথাটা অজস্রবার শুনেছিল পুন্নি। শুনে প্রতিবারই হেসে উঠত, 'তা ভালই তো কর্‌সিল। শেয়ালে খাইলে, আইজ এই জ্বালাযন্ত্রণা সওন লাগত না।'

'যাইট বাছা! ওমন অলুক্ষণে কথা মুখেও আইনো না!...এক একটা কইরা মাইয়া হইতো আর বুড়ি গাল পাইড়া আমার চোদ্দো গুষ্টির পিণ্ডি চটকাইতো।'

হেসে উঠত পুন্নি, 'তুমি কও, হুনি। তবে আমি তো ঠাকুমারে চিরকাল শান্তশিষ্টই দ্যাখ্‌সি।'

রেগে যেত নয়নবালা, 'তুই দ্যাখছস্‌ই ক'টা দিন তারে? তর যহন জ্ঞামগম্যি হইসে, তহন তো বুড়ি রোগে ভুইগা ভুইগা এক্কেবারেই কাহিল। তা কোন্দল করনের জোর পাইব কই থনে? নাইলে এককালে বুড়ি কী জ্বালানডাই না জ্বাল'ইসে আমারে!'

নয়নবালার শিওরে বসে এইসব কথাই ভাবছিল পুন্নি। ভয়ে পুন্নির সামনে কান্নাকাটি না করলেও, মা যে লুকিয়ে দাদা-দিদিদের জন্য প্রায়ই কাঁদত, সেটুকু সহজেই টের পেত পুন্নি।

বারান্দায় কাঠের বেঞ্চটায় বসে একের পর এক বিড়ি ফুঁকছেন রাধারমণ। পুন্নি জানে, ধীরস্থির মানুষটা কাঁদবে না, বুকচাপা যন্ত্রণা বিড়ির ধোঁয়ার সাথে মিলেমিশে থেকে থেকেই দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে আসবে। সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পাবেন না, পাশেই বসা যতীনখুড়ো কিংবা ওই পালপাড়ার দিকের মানুষটা, যাঁকে পুন্নি চেনে কিন্তু নাম জানে না।

'আহা লো! বড় ভাল গেলি লো নয়নবালা! পূর্ণবতী ছেলি, লক্ষ্মী ছেলি—কী সোন্দর মরণ! পায়ে আলতা, সিঁথোয় সিঁদুর... আমি আইজ বারো বছর কপালপোড়া, মড়িও না, তড়িও না। হ্যায় থাকতে আমারও মর্যাদা ছেল, সরমান ছেল... এখন পোলা-বউয়ের লাথি-ঝ্যাঁটা খাইয়া...'

'পেটের সন্তান তো না, শত্রু! সৎমা না, আপন মা—দশ মাস কাল প্যাটে রাখসে। তারে একটা দিন তিষ্টাইতে দেলি না।'

গ্রামের মেয়ে-বউ-বুড়িদের জটলায়, এইসব কথাগুলো ভাসছিল। শুনছিল পুন্নি। মরাবাড়িতে এখনও কান্নার রোল ওঠেনি। প্রতিবেশিনীদের টুকরো-টাকরা বিলাপ, আর দু'-চারজনের নাকেমুখে আঁচল চাপা দেওয়া অবধিই সীমিত শোক। অন্য ছেলেমেয়েদের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। একে একে এসে তারাই বিলাপের সুর তুলবে। আছড়ে-পিছড়ে, বুক চাপড়িয়ে কাঁদবে। নয়নবালার এক সন্তান পুন্নিও। গ্রামের লোকে বলে মদ্দা মাগী। পাষাণী। মোড়লবাড়ির খেন্তিবুড়ি মুখরা, স্পষ্ট বক্তা বলে খ্যাতি আছে গ্রামে। একটু আগে সেই বুড়ি পুন্নিকে গাল দিয়ে গেল খানিক, 'পাষাণী মাগী, খাইলি তো মাডারে, এইবার বাপডারে খা। তর পরান জুড়াক।'

খটখটে চোখে শুধু তাকিয়েছিল পুন্নি, উত্তর দেয়নি। তা হলে মরাবাড়ির উঠোনেই হয়তো তুমুল বেঁধে যেত। উঠোনে মায়ের মরা দেহ, তাই

ঝগড়াঝাঁটিতে মন ছিল না পুন্নির। না হলে পুন্নিও মুখ খললে ভূত পালায় সাত রাজ্যি ছেড়ে।

নয়নবালার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে পুন্নি। ভয় পাওয়ার কোনও চিহ্ন নেই নয়নবালার মুখে। বরং ঠোঁটের কোণ ছুঁয়ে আছে একটুকরো হাসি। পুন্নি মনে মনেই বলে, তলে তলে এই মতলব ছেল তোমার। হাড়-জ্বালানি, নিত্য-মরণী তো ছিলাই, মরণকালে ভালই অপদস্থ কইরা গ্যালা।

কান্নার সুর ভেসে আসছে চণ্ডীতলার দিক থেকে। পুন্নি বুঝতে পারে মেজদি আসছে। সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে মেজদিই—এক হল্ট পরেই সোনঘাটায়। রাতেই যতীনখুড়োর ছেলে চণ্ডী গিয়েছিল খবর দিতে। ফাস্ট ট্রেন ধরে ফিরছে।

মনে মনেই অঙ্ক কষে পুন্নি—এর পর আইবো, রানাঘাট থিকা বড়দি। তারপর একলগে শ্যামনগরের দুই মাইয়া, সেজদি আর বুনি। সব শ্যাষে কোইলকাতার বাবু-বিবি। দাদা-বউদিকে এই নামেই সম্ভাষণ করে থাকে পুন্নি।

বছর তিন আগে শেষ এসেছিল দাদা-বউদি। বুনির বিয়েতে। পুন্নির বুকের ভেতর তখন মাটিচাপা দেওয়া আগুন, সর্বক্ষণ জ্বলে পোড়ে। বিয়ের পরদিন সকালেই তুমুল ঝগড়া বেঁধেছিল সবার সঙ্গে।

ছোট মেয়ে বিদেয় দিয়ে তখন সুর তুলে কান্না জুড়েছে নয়নবালা। দাদা-বউদি-দিদি-জামাইবাবুরা আড্ডা জমিয়েছিল বারান্দায় বসে। মায়ের স্বাভাবিক কান্নাকে গুরুত্ব দেয়নি কেউই। হাসি-ঠাট্টা বেশ জমেই উঠেছিল ওদের। উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল পুন্নি। হঠাৎ অকারণেই কেন যেন জ্বালা ধরেছিল গায়ে। ঝাঁটা হাতেই তেড়ে গিয়েছিল নয়নবালার দিকে, 'কই গাদা গাদা মাইয়া বিয়াইসো, তা বিয়া তো দেবাই! অত ফ্যাচ কান্দনের কী আছে?...'

কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল সকলেই। নয়নবালাও।

'কই বাকি কামগুলা করবে ক্যাডা? এই মরা হকুনডা?' রাগের আতিশয্যে নিজের বুকেই ঝাঁটা ঠুকেছিল পুন্নি।

বড়দি ঝাঁঝি দিয়ে উঠেছিল, 'তর হইসেডা কী রে মাইয়া? অত বাড় বাড়ছস ক্যান?'

খুব জোরে বকে উঠেছিল দাদা, 'মায়ের লগে অমন কইরা কথা কও?'

পুন্নি তখন উন্মাদ। হিতাহিত জ্ঞানহীন, 'তা কেমন কইরা কথা কমু? সোহাগী কথা হেখানের লিগা আমার তো পটের বিবি নাই।'

'কী কইলি?' রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়েছিল দাদা। কান্না জুড়েছিল বউদি।

'ঠিকই কইসি। আমি না হয় সামনা দিয়া পিছা মারি। তোমরা যে পেছন দিয়া হুল ফোটাও, কোনডা বেশি টাটায় জিগাও তো ওই হাড়জ্বালানিরে?... হা পোড়াকপাল! কারে সাক্ষী মানতাসি আমি! ওই শত্রু কি আর সত্যি কথাখান তোমাগো সামনে মুখ ফুইটা কইবো।'

একদিকে পুন্নি। অন্যদিকে বাকিরা। তবুও শেষমেশ পিছপা হয়েছিল বাকিরাই। রাগ করে কেঁদেকেটে চলে গিয়েছিল সবাই। বাজারের মুখে রাধারমণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওদের। বলে গিয়েছিল, আর আসবে না কেউ।

দুখঃবেদনা উষ্ণ অভিমান নিয়ে থমথমে মুখে বাড়ি ফিরেছিলেন রাধারমণ। মেঘলা মুখে তখনও উঠোনেই দাঁড়িয়েছিল পুন্নি। আশঙ্কা ছিল রাগে-দুঃখে হয়তো ফেটে পড়বে বাবা। কিন্তু রাধারমণ ঠান্ডা স্বরে শুধু বলেছিলেন, 'একটু চা দেবা মা!' নিজেকে কেমন সর্বস্বান্ত মনে হয়েছিল পুন্নির। বাবা বকে উঠলে হয়তো মেঘ কেটে যেত। কিন্তু বাবার স্বরের কোমলতায় অঝোরে বৃষ্টি নেমেছিল সেদিন। যা পুন্নির আকাশে বিরল।

বুনিরা এসেছিল দশমঙ্গলে। ছোট বোনের স্বামীর সঙ্গে ব্যবহার যতটা মার্জিত হওয়া উচিত, ততটাই রেখেছিল পুন্নি। উজ্জ্বল-উচ্ছল বুনির সঙ্গেও আর আগের মতো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি। বুনির সেই পূর্ণতা, সেই শরীর বেয়ে ঝরে পড়া ছন্দ, ভাল লাগত ঠিকই—দূর থেকে বোনের কমনীয় মুখের দিকে চেয়ে থাকত অপলক। অথচ মুখোমুখি হলেই অন্তরিত বেদনা আড়াল করতে পারত না কিছুতেই। ওর কালো মুখে ছড়িয়ে পড়া ঈর্ষার কালিমা লুকোতে, যতটা সম্ভব বুনির কাছ থেকে দূরে দূরেই সরে থাকত ও।

অনেকদিন পর বাবা একদিন বলেছিল, 'মাইয়া তর মুখের জ্বালায় কাকপক্ষীও ভিটা ছাড়া।'

পাটকাঠির ধোঁয়ায় তখন পুন্নির চোখ লাল, ছলছলে, 'তা বিষ দাও না ক্যান? সব জ্বালাযন্ত্রণা একলগেই জুড়াইয়া যাক।' অতটুকুতেই হয়তো খেন্ত হত না পুন্নি। হঠাৎ চোখ পড়েছিল বাবার দৃষ্টিপথে। সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সুবলকাকার মেয়ে-জামাই। অ্যাটাচির ভারে মিঠুর ঢ্যাঙা বরটা কেমন বেঁকে বেঁকে হাঁটছে। মনে পড়েছিল পুন্নির, আজ জামাইষষ্ঠী।

বাবার সেই উদাস দৃষ্টি হয়তো সেদিন পুন্নিকে আঘাত দিয়েছিল কিংবা হয়তো নিজের লজ্জা-গ্লানি ঢাকতেই খ্যাপা রাগের আবরণ নিয়েছিল ও। আধফোটা ডালের হাঁড়িটা ধপ করে মাটিতে নামিয়ে, জল ঢেলে দিয়েছিল উনুনে। কেমন আহত চোখে ওর দিকে তাকিয়েছিল বাবা। পুন্নির ধোঁয়া লাগা চোখে তখন টলটলে জল।

বাঁশের মাচায় শুয়ে নয়নবালা। পরনে লাল পেড়ে নতুন শাড়ি। পায়ে টকটকে লাল আলতা। সিঁথি-কপাল সিঁদুরে মাখামাখি, গ্রামের এয়োরা পরিয়ে দিয়ে গিয়েছে একে একে।

নয়নবালা প্রস্তুত। পাটকাঠির বেড়া দিয়ে ঘেরা উঠোনের বাইরে নারায়ণ মণ্ডলের ট্রাকটারটাও প্রস্তুত। সর্বক্ষণ গোবর-মাটি মেখে থাকা ট্রলিটা, এই মুহূর্তে ধোয়া-মোছা, ঝকঝকে।

এখন অপেক্ষা শুধু অনিলের। কলকাতায় সংবাদ দেওয়া হয়েছে রাতেই। পাশের বাড়ির কানাইদা রাতেই ছুটেছিল সাইকেল নিয়ে, ছ'মাইল রাস্তা মুড়াগাছা। ডেকে তুলেছিল এসটিডি বুথের লোককে।

এখন নারায়ণ মণ্ডলকে সেই কথাই বলছিল কানাই। রাতের পরিশ্রম ব্যর্থ হওয়ার বিরক্তি স্পষ্টই প্রকাশ পাচ্ছিল ওর স্বরে, 'বোঝলেন কাকা। পুন্নিডায় বারণ করতাসেল—যাইও না কানাইদা! এই রাতে সাইকেল ঠ্যাঙাইয়া অত দূর যাইয়া কী করবা? তোমরা কী ভাবতাসো? খবর পাইয়াই বাবু ছুটবো! কাইন্দা-কাইটা ফিট পড়বো? ছাই! ওই পোড়াকপালির কপালে অত সুখ ল্যাখেন নাই বিধাতা! থাকতে দেয় নাই এক কুই, মরলে দ্যাবে সাত কুই!'

হয়তো কানাইয়েরই দুর্ভাগ্যবশত পাশেই দাঁড়িয়েছিল ওর বউ। আঁধার ঘুটঘুটে রাতে, স্বামীর সাইকেল ঠেঙিয়ে অত দূর পথ যাওয়ার ব্যাপারে ওর সায় ছিল না বিন্দুমাত্রও। কিন্তু পুন্নি! যার জিবের ডগায় বিষ, পেটের পিত্তি অবধি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। সেই পুন্নিকে ছোবল মারার সুযোগ কোনওভাবেই হাতছাড়া করতে চায়নি কানাইয়ের বউ। তাতে ঘরের মানুষটা না হয় ছয় মাইল রাস্তা সাইকেলই ঠ্যাঙাল।

'তুমি যাও তো গা, যাও। প্যাটের পোলা, মায় মরলে চোখে জল নাই গড়াইক—পুরুষমানুষ, বুক তো পুড়বোই। তায় আবার দেবতুল্য মানুষ অনিলদা। দুইটা কথা কইতে পারলে পরান জুড়াই যায়। যাও যাও, তুমি যাও—শ্যাওড়া গাছ-তেঁতুল গাছ দ্যাইখা যাইও, ভূত-প্যাতের তো অভাব নাই।' শেষ কথাগুলো পুন্নির দিকে ট্যারা চোখে তাকিয়েই বলেছিল কানাইয়ের বউ। হেসে উঠেছিল পুন্নি। আর কটাক্ষ নয়, এবার সোজাসুজিই হুল ফোটাতে চেয়েছিল কানাইয়ের বউ, 'যা লো, যা। তুই আর ভাইয়েরে কস কী? মায় মরসে, দেহটা ঠান্ডা অব্দি হয়ে নাই! এরই মধ্যে হাসি ফোটে তর ওই পোড়া মুখেই।'

আবার হেসেছিল পুন্নি, 'কথাখান ঠিক কইলা না বউ! মায় আর মরলো কই! ওরে তো জ্বালাইয়া পোড়াইয়া মারলাম আমি। খুদুর মায়, খেন্তিবুড়ি আরও ক্যাডায় ক্যাডায় ক্যান কইয়া গেল! শোনো নাই তুমি? আমিই মাডুম, আবার আমিই কাঁদুম—হ্যাষে তোমরাই কইবা পাষাণী মাগীর ভণ্ডামি!'

রান্নাঘরের পৈঠায় বসে পুন্নি। মেজদি আসতেই

সকলেই উদগ্রীব দৃষ্টিতে রাধারমণের দিকে তাকায়। কেমন যেন কাতর চোখে পুন্নির দিকে চেয়ে থাকেন রাধারমণ। ঠিক সেই সময়েই অনিল আসে। বউ-ছেলে সঙ্গে নিয়ে। এবার যেন কান্নার ঝড় ওঠে। বোনরা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে ভাইকে। বড়দি বিলাপের সুরে বলে, 'ভাই আইছস? মায় আর নাই রে! শনি! শনিতে খাইছে আমাগো মায়েরে!'

নয়নবালার কাছ থেকে উঠে এসেছিল ও। গরুগুলো থেকে থেকে ডাকছিল। গোয়াল পরিষ্কার করে, গরুগুলোর খাবার মেখে দিয়েছে ও। নান্দায় জল দিয়েছে। এক পাক মাঠেও গিয়েছিল। বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে রাধারমণের জমি। ছয় বিঘের দাগ। আগে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রায় বাইশ বিঘে জমি ছিল। মেয়েদের বিয়ে দিতে অনেকটাই গিয়েছে। বাকিটা গিয়েছে অনিলকে কলকাতায় রেখে পড়াতে। এখন ওই ছ'বিঘেই বেঁচেবর্তে আছে কোনওরকমে। পুন্নির বিয়ে দিতে ওটুকুও হয়তো যাবে।

ওই জমির একপাশে খাল। খাল ডিঙোলে মুসলমান পাড়া। সেই পাড়ার রসুল মিঞা দুই ছেলে নিয়ে গত দু'দিন ধরে কাজ করছে রাধারমণের জমিতে। পাটখেতে ঘাস তুলছে। পুন্নির হঠাৎ মনে হয়েছিল, রসুলচাচারা হয়তো মায়ের মৃত্যুসংবাদ জানে না। ওরা হয়তো রোজের মতোই ভোর থেকে কাজে লেগে গিয়েছে। ধামায় মুড়ি আর দু'বান্ডিল বিড়ি নিয়ে পুন্নি গিয়েছিল মাঠে। রসুলচাচা বসেছিল আলে। পুন্নিকে দেখেই বলে উঠেছিল, 'তুমি আবার আইতে গ্যালা ক্যান মাঠান? আমরা কামে আইসিলাম, সবে হাত লাগাইসি, জীবন মণ্ডলের ছোট পোলাডা দুঃসংবাদডা দেলো। নবী আর দিলখুশ তো তোমাগো বাড়িপানেই গেলো। হ্যাঁ গা মাঠান, ওই মণ্ডলের পো তোমার নামে ভারি কু-কথা কইতেসেল...। তুমি কাঁইজা করসিলা বইলাই নাকি, তোমার মায়...'

রসুলচাচাকে মাঝেই থামিয়ে দেয় পুন্নি, 'ছাড়ো তো চাচা, সুনাম-বদনামে আমার কী আইবো-যাইবো! গামছাখান পাতো চট কইরা, মুড়িডা দিয়া আমি ফিরুম।'

গামছা বিছোতে বিছোতে রসুল মিঞা বলে, 'ইডা কিন্তু ন্যায্য না মা!...'

মুড়িটা ঢেলে দিয়ে ফিরে হাঁটা ধরেছিল পুন্নি। কোনটা ন্যায্য নয়—আজ কাজ না করে মুড়িটুকু নেওয়া, না মণ্ডলের পো'র পুন্নি সম্বন্ধে কুকথা বলা—সেটুকু রসুল মিঞার পেটেই থেকে গিয়েছিল। ফেরার পথে দূর থেকেই বহু কণ্ঠের মিশ্রিত সুরের বিলাপ শুনতে পেয়েছিল।

বড়দি, সেজদি আর বুনিও এসে গিয়েছিল। ওদের কান্নার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল গ্রামের মেয়ে-বউ অনেকেই। কান্নার রোল উঠেছিল উঠোনে। ভিড়ের ভেতর যায়নি পুন্নি। ও চুপচাপ বসেছিল রান্নাঘরের পৈঠায়।

গোলার পাশে হাঁসের ঘরটায় চোখ পড়তে হঠাৎ খেয়াল হয়, রাতে আর হাঁসগুলোকে ঘরেই তোলা হয়নি। ঝোপে-জঙ্গলে, গাছেই হয়তো রাত কাটিয়েছে ওগুলো। খানিক আগে পাট পচানোর ডোবাটার কাছে দেখেছিল কতগুলোকে।

কাল দুপুরের পর লক্ষ করেছিল পুন্নি, সর্দিতে ফ্যাচফ্যাচ করছে নয়নবালা, চোখ দুটো লাল, ছলছলে। খিঁচিয়ে উঠেছিল পুন্নি, 'নিত্য মরণী আবার সর্দি লাগাইসো তো? একবারেই মর না ক্যান? শান্তি পাই আমি। পিটাপিটানির স্বভাব। আরও যাও অবেলা কইরা ওই খেস্তিবুড়ির পুকুরে, আরও কয়ডা ডুব দিয়া আসো গা। আর ভেজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া, পোলা-বউয়ের লগে বুড়ির কাঁইজাও খানিক শুইনা আইসো। তোমারে শালিস মাইনা বুড়ি ক্যামন নাঁচবেনে দ্যাইখো!'

সন্ধের মুখে বাজার গিয়েছিল পুন্নি। শুধু ডাক্তারের থেকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আনতে। যাওয়ার আগে নয়নবালাকে শাসিয়ে গেছিল, 'হাঁসগুলা দ্যাইখো। গুইনা ঘরে তুলবা। খাটাসে খাইলে, ফিরা আইসা তোমারে খামুনে আমি!'

ভয়ে ভয়ে নয়নবালা বলেছিল, 'ঔষধ আনন লাগবো না। অ্যামনেই কইমা যাইবোনে।'

গজগজ করতে করতে হাঁটা ধরেছিল পুন্নি, 'অ্যামনে অ্যামনেই যদি কইমা যাইতো, তা হইলে আমার ডিম ব্যাচা টাকাগুলান হপ্তা হপ্তা শুধু ডাক্তার খাইতো ক্যামনে!'

গুনে গুনেই হাঁসগুলো ঘরে তুলছিল নয়নবালা। আধো-অন্ধকারে ঝাঁকড়া বাতাবিলেবু গাছটার আড়ালে ওত পেতে থাকা জন্তুটা চোখে পড়েনি। আচমকাই লাফ দিয়েছিল ওটা। সাদা-কালো একটা বড়সড় বেড়ালের মতো। একটা হাঁসের ঘাড় কামড়ে মুহূর্তে উধাও হয়ে গিয়েছিল অন্ধকারে। বাকিগুলো সব ডানা ঝাঁপটিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল এদিক-ওদিক।

নয়নবালার মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়েছিল শুধু, 'স-র্ব-না-শ!' বুকের ভেতর ধরাস-ধরাস করতে করতেই মোচড় দিয়েছিল যন্ত্রণা—মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল নয়নবালা। মাঠ থেকে ফিরে চেতনাশূন্য নয়নবালাকে কোলে করে ঘরে তুলেছিলেন রাধারমণ।

বাজার থেকে ফিরে টর্চবাতির আলোটা প্রথমেই হাঁসের ঘরের ওপর ফেলেছিল পুন্নি। ঝাঁপ খোলা আর মাটিতে ছড়ানো পালক দেখেই চিল-চিৎকার দিয়েছিল, 'হা শনি! এ আমার কী সর্বনাশ করলা গো!'

অতটুকুতেই কি আর শান্ত হত পুন্নি! হঠাৎ চোখ পড়েছিল, বারান্দায় দাঁড়ানো রাধারমণের থমথমে মুখের দিকে। ধীর-স্থির, শান্ত প্রকৃতির মানুষটাকে কেমন যেন উতলা-উদ্‌ভ্রান্ত মনে হয়েছিল। আশঙ্কা জড়ানো স্বরে পুন্নি বলে উঠেছিল, 'কী হইসে?'

'আর একবার যা তো মা, ছুইটা শুধু ডাক্তাররে ডাইকা আন। তর মায়ের শরীলের ভাবগতিক ভাল ঠেক্‌তাসে না।'

শুধু ডাক্তারকে নিয়ে পুন্নি ফেরার আগেই, শীতল হয়ে গিয়েছিল নয়নবালার দেহ। শুধু ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়তেই, স্তব্ধ দুটো মানুষ

হাঁসগুলো ঘরে তুলছিল নয়নবালা। আধো-অন্ধকারে ঝাঁকড়া বাতাবিলেবু গাছটার আড়ালে ওত পেতে থাকা জন্তুটা চোখে পড়েনি। আচমকাই লাফ দিয়েছিল ওটা। একটা বড়সড় বেড়ালের মতো। একটা হাঁসের ঘাড় কামড়ে মুহূর্তে উধাও হয়ে গিয়েছিল অন্ধকারে। বাকিগুলো সব ডানা ঝাঁপটিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল এদিক-ওদিক। নয়নবালার মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়েছিল শুধু, 'স-র্ব-না-শ!'

যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পাথর হয়ে গিয়েছিল। কখন ডাক্তার বেরিয়ে গিয়েছিলেন, কখন গ্রামের লোক খবর পেয়ে এসে জড় হয়েছিল, খেয়ালই করেনি। হয়তো সংবিৎ ফিরেছিল, খেন্তিবুড়ির তীক্ষ্ণ স্বরে, 'কস কী লো কানাইয়ের বউ। তৃণ সন্ধ্যাকালে কাঁজহী বাঁধাইসিল?'

পুন্নিদের ডান পাশের বাড়ির লক্ষ্মীমণি জ্যাঠাইমা সায় দিয়েছিল কানাইয়ের বউয়ের কথায়, 'হ্যাঁ গো দিদি। আমিও হুনছি, ভীষণ চেঁচাইতেছেল পুন্নিডায়।'

উঠোনের কান্না এখন থিতিয়ে এসেছে। সেজদি মাঝেমধ্যে ফুঁপিয়ে উঠছে শুধু। মাটিতে থেবড়ে বসে বুনি। ওর আঁচলের তলায়, ওর আট মাসের বাচ্চা। পুন্নি লক্ষ করে পেয়ারা গাছটার একটা ডাল ধরে দাঁড়িয়ে সুজয়দা। কেমন যেন আনমনা ভাবে তাকিয়ে আছে ওরই দিকে।

এই সুজয়দা একদিন ঘটা করে এসেছিল এই বাড়িতে। সেজদি-সেজজামাইবাবু, দাদা-বউদির সঙ্গে। সুজয়দার দাদা-বউদিও এসেছিলেন। সুন্দর ফুটফুটে একটা মেয়ে ছিল, ওর বউদির কোলে।

সুজয়দা সেজদির দূর সম্পর্কীয় দেওর। প্রস্তাবটা সেজজামাইবাবুই দিয়েছিল ওদের। ওরা রাজি হতে, দাদা-বউদিকে কলকাতা থেকে খবর দিয়ে আনিয়ে, একসঙ্গে এসেছিল সবাই।

সেজদি রান্নাঘরে এসে মাকে বলেছিল, 'ওরা কইতাসে সাজাইয়া-গোছাইয়া ঘটা কইরা মাইয়া দ্যাখান লাগবো না। ওরা আইজ থাকবো, অ্যামনেই দ্যাখাদেখি হইয়া যাইবো।'

মা হতাশ স্বরে বলেছিল, 'ওরা করবো? পোলা তো সোন্দর, সরকারি চাকুরাও। রংডাই যা একটু চাপা।'

রেগে গিয়েছিল সেজদি, 'এমন সব কথা কও না মা? তোমার মাইয়া য্যান দুধে-আলতা!'

উঠোন আড়াল করে, রান্নাঘরের বারান্দায় বসেই সবজি কুটছিল পুন্নি। হঠাৎ বঁটিটা কাত করে রেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল, 'ক্যান তরা রোজ রোজ রঙ্গ লাগাস? আমি তো পেত্নিই। এই কালো-পেত্নিকে বিয়া করবো ক্যাডা? হুদাহুদি এই রঙ্গ করতে গিয়া গরিব বাপডার কতগুলান পইসা গচ্চা...'

পুন্নির একটা হাত চেপে ধরেছিল সেজদি, 'লক্ষ্মী বুন আমার, তরে আঘাত দ্যাওনের লিগা ও কথা কই নাই আমি। মায় এমন এমন একেকখান কথা কইয়া বসে! বুন তুই যা, এই জামাখান ছাইড়া, একখান ভাল কাপড় পাইরা নে। কারে কখন কার ভাল লাইগা যায়, কওন তো যায় না। যার লগে যার ল্যাখা।'

বিকেলে সুজয়দার বউদি বলেছিল, 'যাও তো বোনটি! ঠাকুরপোকে নিয়ে তোমাদের মাঠঘাট সব দেখিয়ে আনো। মেসোমশাইয়ের মুখে শুনলাম, তুমিই নাকি সব দেখাশোনা করো!'

পুন্নি বলেছিল, 'চলেন।'

'চলেন কী গো!' পুন্নির পেটের কাছে আলতো করে চিমটি কেটেছিল বউটা, 'আমি আবার কোথায় যাব? যাবে শুধু তোমরা দু'জনায়। আগেভাগে ভাল করে দেখে বুঝে নাও, নইলে কিন্তু শেষমেশ আমার মতোই হা-পিত্যেশ করতে হবে।' কথাটা শেষ করে সুজয়দার দাদার দিকে ট্যারা চোখে তাকিয়েছিল বউটা। হেসে উঠেছিল সকলেই।

বিস্তীর্ণ সর্ষেখেত তখন ফুলে ফুলে হলুদ। সূর্যের রক্তিম ছটায় ঝলমল করছিল। একটা ঢিবির মতো জায়গায় ঘাসের ওপর বসেছিল ওরা। মাঠে মাঠে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সুজয়, কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম জানান দিচ্ছিল। খানিকক্ষণ বসার পর পুন্নি বলেছিল, 'সন্ধে হতে...'

'জায়গাটি কিন্তু নাইস! তাই না?'

স্মিত হেসেছিল পুন্নি, 'আমি আজন্ম দেখছি।'

'জন্ম থেকে দেখা আর আজকের দেখার মধ্যে কি একটুও পার্থক্য নেই?' সুজয়ের গলার স্বর আবেগঘন ছিল।

চোখ তুলে পরিপূর্ণ তাকিয়েছিল পুন্নি। থিরথির কেঁপেছিল পলক, তারপর লজ্জার ভারে ঝুঁকে গিয়েছিল।

'কিছু তো বলো পূর্ণিমা!'

এতক্ষণ অজস্র কথা বলছিল পুন্নি। ওদের জমির দাগ কতটা, কোন জমিতে কোন ফসল ভাল হয়, পটলের কেয়ারি কীভাবে বাঁধে, পাম্পের জল কীভাবে ভাগ হয়—তারও কত কিছুই। কিন্তু সেই বলা আর এই 'কিছু বলা' যে অন্য, তাগিদও যে অন্য, সেটুকু সহজেই বুঝেছিল পুন্নি।

ওর হাতের ওপর হাত রেখেছিল সুজয়, 'দেখো পূর্ণিমা, একটু আগে সূর্যের রশ্মিতে কেমন ঝলমল করছিল চারধার। এখন সূর্য ডুবে যেতে সব কেমন ম্লান! এই ম্লানতার মধ্যেও কিন্তু একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য আছে, লাবণ্য আছে। এই সৌন্দর্যে চোখ ধাঁধায় না, চোখ জুড়োয়।'

কী এক রোমাঞ্চিত ভাললাগায়, কী এক বিচিত্র অনুভূতিতে বিহ্বল পুন্নি, স্বপ্নময় চোখে তাকিয়েছিল। ওর হাতে আলতো করে চাপ দিয়েছিল সুজয়।

বাড়ি ফিরে ওরা দেখেছিল, হইহুল্লোড় আরও বেড়েছে। মেজদি-মেজজামাইবাবু এসেছেন। বুনিও এসেছে। সপ্তাহখানেক আগে মেজদির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল ও। পুন্নি পরিচয় করিয়েছিল, 'এ আমার ছোট বোন পরিণীতা।'

পুন্নি লক্ষ করেছিল, বুনির মুখের দিকে মোহময় দৃষ্টি মেলে নিষ্পলক তাকিয়েছিল সুজয়দা।

পরদিন যাওয়ার আগে, সুজয়দার বউদি একটু ইতস্তত করে বলেছিল, 'আমার দেওর তো কালো, বুঝতেই পারছেন। মেয়ে একটু ফরসা না হলে... আপনারা যদি ছোটজনকে দেন... আমাদের কোনও দাবিদাওয়া নেই।'

গাঢ় নিশ্বাস নেয় পুন্নি। কেমন আলুথালু বিস্রস্ত বুনি, এই মুহূর্তে মাটিতে লাট হয়ে বসে। তিন বছরেই কত রোগা হয়ে গিয়েছে মেয়েটা। সেই সতেজ উদ্ধত যৌবনে যেন ধস নেমেছে, ম্লান হয়ে গিয়েছে সেই দুধ-সাদা গায়ের রঙও।

নারায়ণ মণ্ডল কাছে এসে দাঁড়াতে, উঠে দাঁড়ায় পুন্নি, 'কিছু কইতাছেন কাকা?'

'কই কী মা, অনেক দেরি হইতাছে! তুমি বরং আমারে টাকাপইসা দাও, তেল-তুল ভইরা রেডি হইয়া থাকি। অনিল আইলে আর দেরি করণ লাগবো না।'

পুন্নি বলে, 'আমি টাকা দিতাছি কাকা, শুধু তেল-তুলই না, কাঠ, কাপড়চোপড় যা সব লাগে কিন্না ফ্যালান।'

ঘরের ভেতর থেকে টাকা এনে নারায়ণ মণ্ডলকে দেয় পুন্নি, 'আর শোনেন কাকা। মুখে আগুন দিমু আমি, তার লিগে যা যা লাগে লইয়েন। আমার লিগে একখান নতুন কাপড় লইয়েন।'

অবাক নারায়ণ মণ্ডল ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। পাশেই দাঁড়ানো ছিল খেন্তিবুড়ি, চেঁচিয়ে প্রায় কেঁদে ওঠে বুড়ি, 'ও মাগো! কী অলুক্ষণে কথা গো! পোলা-মাইয়াগো লিগা ছ্যাঁচাইয়া-ছ্যাঁচাইয়া মা-ডা মরলো। এহন ওই মরা শরীলডার লগেও তুই কোন্দল করতে ছাড়বি না। আমাগো ভাই থাকতে তুই ক্যান মুখে আগুন দিবি হুনি?'

গ্রামের একমাত্র পুরুতঠাকুর নকুল চক্রবর্তী এগিয়ে আসেন সামাল দিতে, 'জানি, তুমি বড় শক্ত ঠাঁই! তবুও এই জিদ, না কইরলেই কি না মা?

দৃঢ় স্বরে পুন্নি বলে, 'না।'

সকলেই উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে রাধারমণের দিকে তাকায়। কেমন যেন কাতর চোখে পুন্নির দিকে চেয়ে থাকেন রাধারমণ। ঠিক সেই সময়েই অনিল আসে। বউ-ছেলে সঙ্গে নিয়ে। এবার যেন কান্নার ঝড় ওঠে। বোনরা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে ভাইকে। বড়দি বিলাপের সুরে বলে, 'ভাই আইছস? মায় আর নাই রে! শনি! শনিতে খাইছে আমাগো মায়েরে!'

বাড়ির পিছন দিকে, টিউবওয়েলে গিয়ে মুখচোখে জল ছিটোয় পুন্নি। নারকেল গাছে বসা একটা কাক ঘাড় কাত করে দেখে। মেজদির মেয়ে টুসি এসে ডাকে পুন্নিকে, 'ওই মাসি চল, ফোটোগ্রাফার আইসে। তোমারে ডাকতাসে।'

ঠোঁটের কোণে হাসি ছুঁয়ে যায় পুন্নির, 'তুই যা মাইয়া! আমারে ডাইকা আর কাম নাই। ভূত-প্যাতের ফোটো ওঠে না।'

অঙ্কন: সুব্রত চৌধুরী